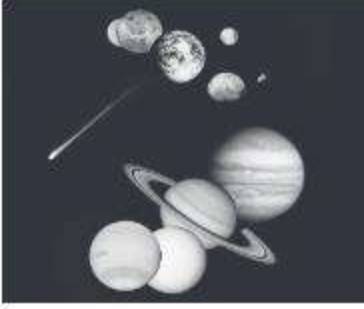


তৃতীয় অধ্যায়

সৌরজগৎ ও ভূমণ্ডল

পৃথিবীর চারদিকে অসীম মহাকাশ বিস্তৃত। মহাকাশে রয়েছে নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা, ধূমকেতু, গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা ও অন্যান্য জ্যোতিষ্মক। মহাকাশের এই অসংখ্য জ্যোতিষ্মক নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বজগৎ। সূর্য বিশ্বজগতের একটি নক্ষত্র। সূর্য এবং এর গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, অসংখ্য ধূমকেতু ও অগণিত উল্কা নিয়ে সৌরজগৎ বা সৌরপরিবার গঠিত। সৌরজগতের সকল গ্রহ ও উপগ্রহের নিয়ন্ত্রক হলো সূর্য। গ্রহ ও উপগ্রহসমূহ সূর্য ও নিজেদের পারস্পরিক মহাকর্ষ শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিক পরিক্রমণ করছে। বিশ্বজগতের বিশালতার মধ্যে সৌরজগৎ নিতান্তই ছোটো, পৃথিবী আরও ছোটো। আয়তনে সৌরজগৎ পৃথিবীর চেয়ে কোটি কোটি গুণ বড়ো। এ অধ্যায়ে আমরা সৌরজগতের ধারণা, গ্রহসমূহ, ভূ-অভ্যন্তরের গঠন এবং বিশ্বের সময় পদ্ধতি, পৃথিবীর গতি ও এর প্রভাব, ঋতু পরিবর্তন, জোয়ার-ভাটার ধারণা ও এর প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হব।



এ অধ্যায় শেষে আমরা-

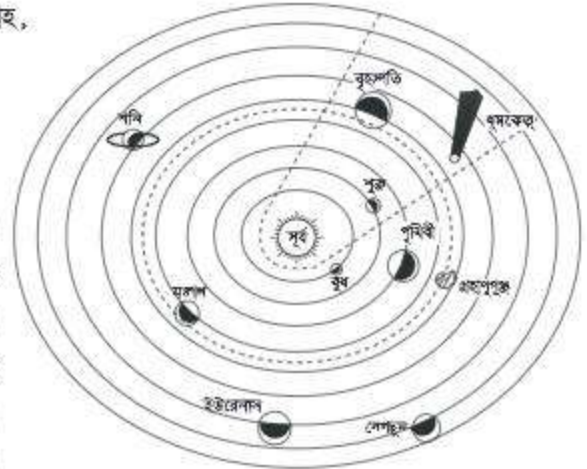
- সৌরজগতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সৌরজগতের গ্রহগুলোর বর্ণনা করতে পারব;
- পৃথিবী নামক গ্রহে জীব বসবাসের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ভূ-অভ্যন্তরের গঠন বর্ণনা করতে পারব;
- সৌরজগৎ ও গ্রহসমূহের অবস্থান একে দেখাতে পারব;
- নিরক্ষরেখা, সমাক্ষ রেখা, দ্রাঘিমা রেখা, মূল মধ্যরেখা, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিশ্বের সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রেখাগুলোর ভূমিকা নির্ণয় করতে পারব;
- বাংলাদেশ ও পৃথিবীর যে কোনো দেশের সময়ের পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা এবং সময় নির্ণয় করতে পারব;
- বিভিন্ন রেখার অবস্থানের চিত্র আঁকতে পারব;
- পৃথিবীর গতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আনুগতিক গতি ও বার্ষিক গতির ধারণার ব্যাখ্যা এবং পৃথিবীর ওপর এই গতির প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- দিব্যাত্রিরহাস-বৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বার্ষিক গতির সাথে বাংলাদেশের ঋতু পরিবর্তনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব;
- নতুন পরিস্থিতিতে গাণিতিক জ্ঞান প্রয়োগ করে সময় নির্ণয় করতে পারব;
- জোয়ার ভাটার ধারণা, কারণ ও শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পৃথিবীর ওপর জোয়ার-ভাটার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরিবেশের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও অভিযোজনে সক্ষম হব।

পরিচ্ছেদ ৩.১ : সৌরজগৎ

সূর্য এবং এর গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু, উল্কা প্রভৃতি নিয়ে যে পরিবার তাকে বলা হয় সৌরজগৎ। সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র হলো সূর্য। সৌরজগতে ৮টি গ্রহ, শতাধিক উপগ্রহ, হাজার হাজার গ্রহাণুপুঞ্জ ও লক্ষ লক্ষ ধূমকেতু রয়েছে।

সূর্য

সৌরজগতের সকল গ্রহ ও উপগ্রহের নিয়ন্ত্রক হলো সূর্য। সূর্য একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ বড়ো। পৃথিবী থেকে এটি প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এর ব্যাস প্রায় ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিলোমিটার। সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতা ৫৭,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিরাট দূরত্বের জন্য সূর্যের অতি সামান্য তাপ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। এ সামান্য তাপ ও আলো ঘাই পৃথিবীর জীবজগতের সকল প্রয়োজন মেটে। অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহগুলোর তাপ ও আলোর উৎসও সূর্য। সূর্যের কোনো কঠিন বা তরল পদার্থ নেই। শতকরা ৫৫ ভাগ হাইড্রোজেন, ৪৪ ভাগ হিলিয়াম এবং ১ ভাগ অন্যান্য গ্যাসে সূর্য গঠিত। সূর্যের মধ্যে মাঝে মাঝে যে কালো দাগ দেখা যায় তাকে সৌরকলঙ্ক (Sun Spot) বলে। সূর্যের অন্যান্য অংশের চেয়ে সৌরকলঙ্কের উত্তাপ কিছুটা কম থাকে। আণবিক শক্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সূর্যে অনবরত হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম এবং হিলিয়াম থেকে শক্তি তৈরি হচ্ছে। সূর্য প্রায় ২৫ দিনে নিজ অক্ষের (Axis) ওপর একবার আবর্তন করে। সূর্যের আলো ও তাপ ছাড়া পৃথিবীতে উদ্ভিদ, প্রাণী কিছুই জন্মাতো না এবং প্রাণের স্পন্দন সম্ভব হতো না।



চিত্র ৩.১ : সৌরজগৎ

গ্রহ : মহাকর্ষ বলের প্রভাবে কতোগুলো জ্যোতিষ্মক সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ করছে; এদের গ্রহ বলা হয়। গ্রহের নিজস্ব আলো ও তাপ নেই। সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা ৮টি। সূর্য থেকে গ্রহগুলোর দূরত্ব অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে অবস্থান করছে – বুধ (Mercury), শুক (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস (Uranus) ও নেপচুন (Neptune)। গ্রহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বৃহস্পতি এবং সবচেয়ে ছোট বুধ।

বুধ (Mercury) : বুধ সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম এবং সূর্যের নিকটতম গ্রহ। এর ব্যাস ৪,৮৫০ কিলোমিটার এবং ওজন পৃথিবীর ৫০ ভাগের ৩ ভাগের সমান। সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করতে এর ৮৮ দিন সময় লাগে। সূর্য থেকে বুধের গড় দূরত্ব ৫.৮ কোটি কিলোমিটার। বুধের কোনো উপগ্রহ নেই। সূর্যের নিকটতম গ্রহ বলে এর তাপমাত্রা অত্যধিক। বুধের ভূত্বকে সমতল ভূমিসহ অসংখ্য গর্ত ও পাহাড় লক্ষ করা গেছে। বুধের আয়তন ৭৪,৮০০.০০০ বর্গ কিলোমিটার।

শুক (Venus) : সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে শূক্রে অবস্থান দ্বিতীয়। এটি পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। সূর্য থেকে শূক্রে দূরত্ব ১০.৮ কোটি কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৪.২ কোটি কিলোমিটার। একে সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে আমরা সন্ধ্যাতারা রূপে এবং ভোরে পূর্ব আকাশে শুকতারা রূপে দেখতে পাই। সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করতে

এর সময় লাগে ২২৫ দিন। শুরুর কোনো উপগ্রহ নেই। পৃথিবীর মতো শুরুর একটি বায়ুমণ্ডল রয়েছে কিন্তু এতে অক্সিজেন নেই। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৯৬ ভাগ। শুরুর নিজ অক্ষে খুবই ধীর গতিতে আবর্তন করে। ফলে শুরুর আকাশে বছরে দুইবার সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়। গ্রহটিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘন মেঘের কারণে অ্যাসিড বৃষ্টি হয়ে থাকে। শুরুর পৃষ্ঠে পৃথিবীর তুলনায় ৯০ গুণ বেশি বাতাসের চাপ রয়েছে। এর আয়তন ৪৬০,২৩০,০০০ বর্গ কি. মি. এবং ব্যাস ১২১০৪ কি. মি.।

কাজ
একক : সৌরজগতের জ্যোতিষ্কগুলোর
বৈশিষ্ট্যসমূহ ছকের মাধ্যমে তুলনা কর।

পৃথিবী (Earth) : পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ। এর আয়তন ৫১০,১০০,৪২২ বর্গকিলোমিটার। পূর্ব-পশ্চিমে এর ব্যাস ১২,৭৫২ কিলোমিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ১২,৭০৯ কিলোমিটার। সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার। পৃথিবী ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এ গ্রহে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন রয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ১৩.৯০° সেলসিয়াস। ভূত্বকে প্রয়োজনীয় পানি রয়েছে। সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতে জীবজন্তু ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য সুবিধাজনক অবস্থা বিরাজ করে। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব ৩,৮১,৫০০ কিলোমিটার।

মঙ্গল (Mars) : সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে পৃথিবীর পরেই মঙ্গলের স্থান। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব ২২.৮ কোটি কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে ৭.৮ কোটি কিলোমিটার। মঙ্গল গ্রহের ব্যাস ৬,৭৭৯ কিলোমিটার এবং ওজন পৃথিবীর প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। এর আয়তন ১৪৪,৭৯৮,৫০০ বর্গ কি. মি.। সূর্যকে পরিক্রমণ করতে মঙ্গল গ্রহের লাগে ৬৮৭ দিন এবং নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট। মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ আছে—ডিমোস ও ফেবোস। এখানে জীবনধারণ অসম্ভব। বায়ুমণ্ডলে শতকরা ৩ ভাগ নাইট্রোজেন ও শতকরা ২ ভাগ আরগন গ্যাস আছে। পানির পরিমাণ খুবই কম। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গল অনেক ঠান্ডা, গড় উষ্ণতা হিমাক্ষের অনেক নিচে। মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগে গিরিখাত ও আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এ গ্রহের পাথরগুলোতে মরিচা পড়েছে। ফলে গ্রহটি লালচে বর্ণ ধারণ করেছে।

বৃহস্পতি (Jupiter) : সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতি। সূর্য থেকে দূরত্বের ভিত্তিতে বৃহস্পতি গ্রহের অবস্থান পঞ্চম। এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় ১,৩০০ গুণ তথা ৬১,৪১৯,০০০,০০০ বর্গ কি. মি.। এর ব্যাস ১,৩৯,৮২২ কিলোমিটার। এটি সূর্য থেকে প্রায় ৭৭.৮ কোটি কিলোমিটার দূরে। বৃহস্পতি ১২ বছরে একবার সূর্যকে এবং ৯ ঘণ্টা ৫৩ মিনিটে নিজ অক্ষে আবর্তন করে। গ্রহটিতে পৃথিবীর একদিনে দুইবার সূর্য ওঠে ও দুইবার অস্ত যায়। এ গ্রহে গভীর বায়ুমণ্ডল আছে। গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের তাপমাত্রা খুবই কম তবে অভ্যন্তরের তাপমাত্রা অধিক। এর ৬৭টি উপগ্রহ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে লো, ইউরোপা, গ্যানিমেড ও ক্যালিস্টো প্রধান।

গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids) : মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝের পরিসরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহাণু একত্রে পুঞ্জীভূত হয়ে পরিক্রমণ করছে। এই পরিসরের মধ্যে আর কোনো গ্রহ নেই। ১.৬ কিলোমিটার থেকে ৮০৫ কিলোমিটার ব্যাস সম্পন্ন গ্রহাণুগুলোকে একত্রিতভাবে গ্রহাণুপুঞ্জ বলে।

শনি (Saturn) : শনি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। এর আয়তন ৪২,৭০০,০০০,০০০ বর্গ কি. মি. এবং ব্যাস ১১৬,৪৬৪ কি. মি.। সূর্য থেকে শনির দূরত্ব ১৪৩ কোটি কিলোমিটার। শনি ২৯ বছর ৫ মাসে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে এবং ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করে। পৃথিবীর চেয়ে শনির ব্যাস প্রায় ৯০০ গুণ বড়ো। খালি চোখে এটি দেখা যায়। শনির বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ, মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস রয়েছে। তিনটি উজ্জ্বল বলয় শনিকে বেষ্টিত করে আছে। শনির ৬২টি উপগ্রহের মধ্যে ক্যাপিটাস, টেটিস, হুয়া, টাইটান প্রধান।

ইউরেনাস (Uranus) : ইউরেনাস সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ২৮৭ কোটি কিলোমিটার। ৮৪ বছরে এটি সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এর গড় ব্যাস প্রায় ৪৯,০০০ কিলোমিটার। এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় ৬৪ গুণ তবে ওজন পৃথিবীর মাত্র ১৫ গুণ। গ্রহটির আবহমণ্ডলে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ অধিক। এর ২৭টি উপগ্রহ রয়েছে। ইউরেনাসেরও শনির মতো বলয় রয়েছে। মিরিভা, এরিয়েল, ওবেরন, আন্ড্রিয়েল, টাইটানিয়া প্রভৃতি ইউরেনাসের উপগ্রহ।

নেপচুন (Neptune) : নেপচুনের গড় ব্যাস ৪৯,২৪৪ কিলোমিটার এবং সূর্য থেকে দূরত্ব ৪৫০ কোটি কিলোমিটার। এর আয়তন ১৭,৬১৮,৩০০,০০০ বর্গ কি. মি.। সূর্য থেকে অধিক দূরত্বের কারণে গ্রহটি শীতল। গ্রহটি অনেকটা নীলাভ বর্ণের। নেপচুন ১৬৫ বছরে সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করে। এর উপগ্রহ ১৪টি। উল্লেখযোগ্য উপগ্রহ হচ্ছে ট্রাইটন ও নেরাইড।

পৃথিবীতে জীব বসবাসের কারণ

পৃথিবীর চারদিক নানা প্রকার গ্যাসীয় উপাদান দ্বারা বেষ্টিত। অদৃশ্য এই গ্যাসীয় আবরণ যা পৃথিবীকে বেষ্টিত করে আছে। তাকে বায়ুমণ্ডল বলে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে লেপ্টে আছে। আর পৃথিবীর সঙ্গে আবর্তিত হচ্ছে। বায়ুর চাপের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠে এর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি এবং উপরের দিকে ঘনত্ব খুবই কম। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের প্রাধান্য রয়েছে। সকল প্রাণীর জন্য অক্সিজেন অত্যাৱশ্যক। কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া অন্যান্য উপাদান বায়ুতে মোটামুটি অপরিবর্তনীয় পরিমাণে থাকে। তবে ধূলা, ধোঁয়া, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি উপাদান বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত জীবের বেঁচে থাকার জন্য বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব অপরিসীম। বায়ুমণ্ডল সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে প্রাণিকুলকে রক্ষা করে। সূর্যের গ্যাসীয় উপাদান, যেমন- কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও অক্সিজেন (O_2) যথাক্রমে উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখে। ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর হলো ট্রোপোমণ্ডল। এ স্তরের গড় গভীরতা প্রায় ১৩ কি.মি.। এটি মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্তর। কেননা, অর্ধতা, কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি এই স্তরে লক্ষ করা যায়। উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ স্তরে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায়। আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত যাবতীয় প্রক্রিয়ার বেশির ভাগই বায়ুমণ্ডলের এ স্তরে ঘটে থাকে। ট্রোপোমণ্ডলের উর্ধ্বসীমাকে ট্রোপোস বলে। ট্রোপোসের গভীরতা সল্প, এখানে বায়ু স্থির। ঝড় বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব না থাকায় বিমান এ স্তর দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করে। বায়ুমণ্ডলে ওজোন (Ozone) গ্যাসের একটি স্তর আছে, যা ওজোন স্তর নামে পরিচিত। এর গভীরতা প্রায় ১২-১৬ কি.মি.। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করায় এর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে প্রায় 80° (চল্লিশ ডিগ্রি) সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। এ স্তরটি পৃথিবীকে প্রাণিজগতের বাস উপযোগী করেছে।

কাজ

একক : পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহে জীব বসবাসের অনুপযোগী হওয়ার কারণের তালিকা প্রস্তুত কর।

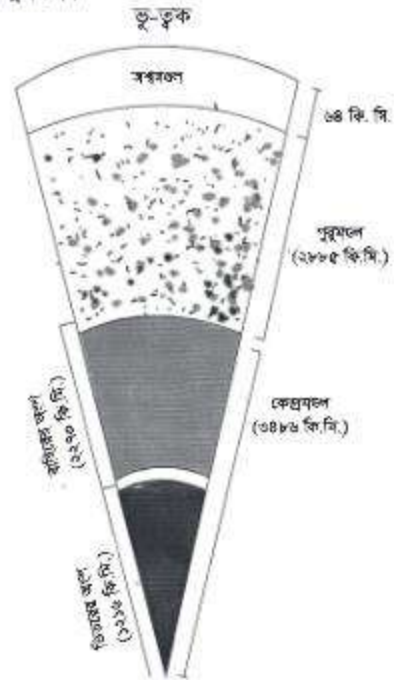
পৃথিবী সূর্য থেকে আলো ও তাপ পায়। সূর্যের আলো ছাড়া পৃথিবী চির অন্ধকারে থাকত। পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্জন থাকত না এবং জীবজগৎ উদ্ভিদ ও প্রাণী কিছুই বাঁচত না। পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ড বায়ুমণ্ডলের গঠন ও উপাদানে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। ব্যাপকভাবে গাছপালা কেটে ফেলা, কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া এবং জ্বালানি তেল, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো থেকে নির্গত ধোঁয়া ও বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে। প্রাণীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই বায়ুমণ্ডলকে বিশুদ্ধ রাখা দরকার।

জীবজন্তুর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন প্রচুর আলো, বাতাস ও পানি। পৃথিবী পৃষ্ঠে গড় তাপমাত্রা 13.9° সেলসিয়াস। ভূত্বকে রয়েছে প্রয়োজনীয় পানি। সূর্য থেকে যে তাপ ও আলো পৃথিবীতে পৌঁছে তাও জীবজন্তুর জন্য সহনীয়। জীবজন্তুর ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য এগুলোও উপযোগী ও প্রয়োজনীয়। এজন্য পৃথিবীতে জীবজন্তু বসবাস করতে পারে।

ভূ-অভ্যন্তরের গঠন

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন ও বিভিন্ন স্তর বিন্যাস সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। কিন্তু ভূমিকম্প তরঙ্গের গতিবেগের তারতম্য দ্বারা ভূঅভ্যন্তরে শিলার ঘনত্বের তারতম্য ও বিভিন্ন স্তরের বিষয় জানা যায়। ভূঅভ্যন্তরে ভূকম্পীয় তরঙ্গের গতি ও প্রকৃতির তারতম্য লক্ষ্য করে ভূতত্ত্ববিদগণ ভূঅভ্যন্তরকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। এ স্তরগুলো হলো— (১) কেন্দ্রমণ্ডল (২) গুরুমণ্ডল এবং (৩) অশ্বামণ্ডল।

(১) কেন্দ্রমণ্ডল : গোলাকার পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৬৩৭১ কি.মি.। পৃথিবীর যে কেন্দ্রের চারদিকে প্রায় ৩৪৮৬ কি.মি. ব্যাসার্ধের গোলাক রয়েছে সে গোলাকটির নাম কেন্দ্রমণ্ডল। বৈজ্ঞানিকদের মতে, কেন্দ্রমণ্ডল লৌহ, নিকেল, পারদ, সীসা প্রভৃতি কঠিন ও ভারী গদার্দ দ্বারা গঠিত। এ স্তরে নিকেল (Nickel) ও লৌহের (Ferus) পরিমাণ বেশি থাকায় এ স্তরটি সংক্ষেপে নাইফ (Nife) নামে পরিচিত। এটি পানি অপেক্ষা ১০/১২ গুণ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশ অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক ঘন। কিন্তু প্রচণ্ড তাপ ও চাপে এটি সম্ভবত কঠিন অবস্থায় নেই। ভূকম্পন তরঙ্গ থেকে বুঝা যায় যে, কেন্দ্রমণ্ডল দুটি অংশে বিভক্ত: বাইরের অংশ এবং ভিতরের অংশ। বাইরের অংশ তরল এবং ভিতরের অংশ কঠিন অবস্থায় আছে বলে অনুমান করা হয়। কেন্দ্রমণ্ডলের বাইরের অংশের বিস্তৃতি প্রায় ২২৭০ কি.মি.। কেন্দ্রমণ্ডলের ভিতরের অংশটি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে প্রায় ১,২১৬ কি.মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে কঠিন অবস্থায় রয়েছে।



চিত্র ৩.২: ভূ-অভ্যন্তরের গঠন

- (২) গুরুমণ্ডল : কেন্দ্রমণ্ডলের উপর থেকে চতুর্দিকে প্রায় ২৮৮৫ কি.মি. পর্যন্ত মণ্ডলটিকে গুরুমণ্ডল বলে। সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ভারী ধাতুগুলোর সমিশ্রুণে এ মণ্ডলটি গঠিত। এর উপরাংশে ১৪৪৮ কি.মি. স্তরে ব্যাসস্ট জাতীয় উপাদান দ্বারা গঠিত বলে একে ব্যাসস্ট অঞ্চলও বলে। সিলিকন (Silicon) ও ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium) দ্বারা মণ্ডলটি গঠিত বলে একে সিমা (Sima) বলে।
- (৩) অশ্বামণ্ডল : গুরুমণ্ডলের উপরের অংশকে অশ্বামণ্ডল বা শিলামণ্ডল বলা হয়। এটা নানা প্রকার শিলা ও খনিজ উপাদান দ্বারা গঠিত। এর গভীরতা মহাদেশীয় অঞ্চলের নিচে সবচেয়ে বেশি এবং মহাসাগরের নিচে সবচেয়ে কম। এর সঠিক গভীরতা সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এর গভীরতা স্থান বিশেষ ৩০ থেকে ৬৪ কি.মি. পর্যন্ত ধরা হয়। যেসব উপাদানে এ স্তর গঠিত তাদের মধ্যে অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য যে, এ স্তরে সিলিকন (Silicon) ও অ্যালুমিনিয়াম (Aluminum) এর পরিমাণ বেশি, তাই এটাকে সিয়াল (Sial) স্তর বলে। অশ্বামণ্ডলের উপরিভাগকে ভূত্বক বলে ও নিম্নভাগকে ভূত্বকের নিম্নাংশ বলে। ভূত্বকই পৃথিবীর কঠিন বহিরাবরণ। এর গভীরতা ৩ কি.মি. (সমুদ্রের তলদেশ) থেকে ৪০ কি.মি. (পর্বতের তলদেশ) তবে গড় গভীরতা ১৭ কি.মি.।

পরিচ্ছেদ ৩.২ : বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সময় নির্ণয় পদ্ধতি

পৃথিবীর মানচিত্রে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য পূর্ব-পশ্চিমে এবং উত্তর-দক্ষিণে কতকগুলো কাল্পনিক রেখা অঙ্কন করা হয়। এগুলোকে যথাক্রমে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা বলে। কোনো স্থানের অবস্থান অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখার সাহায্যে জানা যায়। দ্রাঘিমার অবস্থান থেকে কোনো স্থানের সময় জানা যায়। অক্ষরেখার সাহায্যে যেমন নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থান জানা যায়, তেমনি মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে অবস্থান জানার জন্য মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমা রেখা ব্যবহার করা হয়। ভূপৃষ্ঠকে সমতল মনে হলেও পৃথিবী প্রকৃতপক্ষে অভিলম্বিত গোলক। তাই পৃথিবী গোলাকার বলে মূল মধ্যরেখা থেকে দূরত্ব কৌণিক মাপে প্রকাশ করা সুবিধাজনক।

অক্ষ, অক্ষরেখা, নিরক্ষরেখা, দ্রাঘিমা রেখা, মূল মধ্যরেখা

অক্ষ, অক্ষরেখা ও নিরক্ষরেখা : পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে কল্পিত রেখাকে অক্ষ (Axis) বলে। এ অক্ষের উত্তর-প্রান্ত বিন্দুকে উত্তর মেৰু এবং দক্ষিণ-প্রান্ত বিন্দুকে দক্ষিণ মেৰু বলা হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য পূর্ব-পশ্চিমে যে কতকগুলো কাল্পনিক রেখা অঙ্কন করা হয় তাকে অক্ষরেখা বলে। দুই মেৰু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেঁটন করে যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে বলা হয় নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা। পৃথিবীর গোলাকার আকৃতির জন্য এ রেখা বৃত্তাকার, তাই এ রেখাকে নিরক্ষবৃত্তও বলা হয়। নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে। নিরক্ষরেখার উত্তর দিকের পৃথিবীর অর্ধেককে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ দিকের অর্ধেককে দক্ষিণ গোলার্ধ বলা হয়। নিরক্ষরেখার সাহায্যে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্ব নির্ণয় করা হয়।

পৃথিবীর বৃত্তের মোট পরিধি হলো ৩৬০° । এই পরিধির কোণকে ডিগ্রি ($^\circ$), মিনিট ($'$) ও সেকেন্ডে ($''$) বিভক্ত করা হয়। নিরক্ষরেখা থেকে প্রত্যেক মেৰুর কৌণিক দূরত্ব ৯০° । অক্ষরেখাগুলো পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং পরস্পর সমান্তরাল। এ কারণে প্রত্যেকটি অক্ষরেখাকে সমাঙ্করেখাও বলা হয়। প্রত্যেক অক্ষরেখা একটি পূর্ণবৃত্ত। বিখ্যাত অক্ষরেখা হলো : ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ বা কর্কটক্রান্তি, ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ বা মকরক্রান্তি, ৬৬.৫° উত্তর অক্ষাংশ বা সুমেরুবৃত্ত এবং ৬৬.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ বা কুমেরুবৃত্ত। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের অক্ষাংশ বলা হয়। সর্বোচ্চ অক্ষাংশ ৯০° । কোনো স্থানের অবস্থান জানার জন্য স্থানটি নিরক্ষরেখার কত উত্তরে বা দক্ষিণে এবং মূল মধ্যরেখার কত পূর্বে বা পশ্চিমে তা জানা প্রয়োজন। একই অক্ষরেখায় অবস্থিত সকল স্থানের অক্ষাংশ এক।

০° থেকে ৩০° পর্যন্ত অক্ষাংশকে নিম্ন অক্ষাংশ, ৩০° থেকে ৬০° পর্যন্ত অক্ষাংশকে মধ্য অক্ষাংশ এবং ৬০° থেকে ৯০° পর্যন্ত অক্ষাংশকে উচ্চ অক্ষাংশ বলে।

দ্রাঘিমা রেখা (Meridians of Longitude)

নিরক্ষরেখাকে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের উপর দিয়ে উত্তর মেৰু থেকে দক্ষিণ মেৰু পর্যন্ত যে রেখাগুলো কল্পনা করা হয়েছে তাকে দ্রাঘিমা রেখা বলে। দ্রাঘিমা রেখাকে মধ্যরেখাও বলা হয়। দ্রাঘিমা রেখাগুলো অর্ধবৃত্ত এবং সমান্তরাল নয়। প্রত্যেকটি দ্রাঘিমা রেখার দৈর্ঘ্য সমান। সর্বোচ্চ দ্রাঘিমা ১৮০° হয়। মধ্যরেখাগুলোর যে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট মধ্যরেখা ধরে এ রেখা থেকে অন্যান্য মধ্যরেখার কৌণিক দূরত্ব মাপা হয়। দ্রাঘিমার সাহায্যে স্থানীয় সময় নির্ণয় করা যায়।



চিত্র ৩.৩ : গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক রেখা

মূল মধ্যরেখা (Prime Meridian)

যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে খিনিচ (Greenwich) মানমন্দিরের উপর দিয়ে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত যে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে তাকে মূল মধ্যরেখা বলে। এই রেখার মান ০ ডিগ্রি ধরা হয়েছে। মূল মধ্যরেখা থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণের সাহায্যে অপরূপ দ্রাঘিমা রেখাগুলো অঙ্কন করা যায়। খিনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে ৪৫ ডিগ্রি পূর্বে যে মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমা রেখা তার উপর সকল স্থানের দ্রাঘিমা ৪৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, খিনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে যে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের দ্রাঘিমা বলা হয়। আমরা আরও জানি, খিনিচের দ্রাঘিমা ০ ডিগ্রি। পৃথিবীর পরিধি দ্বারা উৎপন্ন কোণ ৩৬০ ডিগ্রি। মূল মধ্যরেখা এই ৩৬০ ডিগ্রিকে ১ ডিগ্রি অন্তর অন্তর সমান দুই ভাগে অর্থাৎ ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব ও ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিমে ভাগ করেছে। পৃথিবী গোলাকার বলে ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা ও ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা মূলত একই মধ্যরেখায় পড়ে। অক্ষাংশের ন্যায় দ্রাঘিমাকেও মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি মিনিট দ্রাঘিমা এক ডিগ্রির ষাট ভাগের এক ভাগের সমান। যেখানে নিরক্ষরেখা ও মূল মধ্যরেখা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে সেখানে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা উভয়ই শূন্য (০) ডিগ্রি। আর এ স্থানটি হলো গিনি উপসাগরের কোনো একটি স্থান। স্থানীয় সময় এবং খিনিচের সময় থেকে কোনো স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায়।

কাজ
একক : গুরুত্বপূর্ণ কাল্পনিক রেখাগুলোর অবস্থান (ডিগ্রিতে ০) ছকে লিপিবদ্ধ কর।

স্থানীয় সময়ের পার্থক্য : পৃথিবী গোলাকার এবং নিজ অক্ষ বা মেরুরেখার চারদিকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অনবরত আবর্তন করছে। ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্যের সামনে উপস্থিত হয়। যে সময়ে কোনো স্থানের মধ্যরেখা সূর্যের ঠিক সামনে আসে অর্থাৎ ঐ স্থানে সূর্যকে ঠিক মাথার উপর দেখা যায়, তখন ঐ স্থানে মধ্যাহ্ন হয়। তখন ঘড়িতে বেলা ১২টা বাজে। মধ্যাহ্ন অনুসারে দিনের অন্যান্য সময় নির্ধারণ করা হয়। ১ ডিগ্রি দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট এবং ১° দ্রাঘিমার ব্যবধানে সময়ের পার্থক্য হয় ৪ সেকেন্ড। কোনো স্থান বা অঞ্চলে যখন বেলা ১২টা তখন সে স্থান থেকে ৫ ডিগ্রি পূর্বে অবস্থিত স্থানের সময় হবে ১২টা + (৫ × ৪) মিনিট বা ১২ ঘণ্টা ২০ মিনিট। একই স্থান থেকে ৫ ডিগ্রি পশ্চিমে অবস্থিত স্থানের সময় হবে ১২টা - (৫ × ৪) মিনিট বা (১২টা - ২০ মিনিট) অর্থাৎ ১১টা ৪০ মিনিট।

খিনিচ সময়ের মাধ্যমে স্থানীয় সময় নির্ণয় : খিনিচের দ্রাঘিমা শূন্য (০) ডিগ্রি। এর সঠিক সময় ক্রোনোমিটার ঘড়ি থেকে জানা যায়। সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে যেকোনো স্থানের দ্রাঘিমা বের করতে হলে উক্ত স্থানের আকাশে সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান দেখে ঐ সময়ে উক্ত স্থানে দুপুর ১২টা ধরা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে খিনিচের সময় ও উক্ত স্থানের সময়-এর পার্থক্য

থেকে ঐ স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা হয়। কোনো স্থান গ্রিনিচের পূর্বে হলে তার স্থানীয় সময় গ্রিনিচের সময় থেকে বেশি হবে এবং কোনো স্থান পশ্চিমে হলে তার স্থানীয় সময় গ্রিনিচের সময় থেকে কম হবে।

স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময়

স্থানীয় সময় (Local Time) : প্রতিদিন পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে তার নিজ মেরুরেখার উপর আবর্তিত হচ্ছে। ফলে পূর্ব দিকে অবস্থিত স্থানগুলোতে আগে সূর্যোদয় ঘটে। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে কোনো স্থানে যখন সূর্য ঠিক মাথার উপর আসে বা সর্বোচ্চে অবস্থান করে তখন এ স্থানে মধ্যাহ্ন এবং স্থানীয় ঘড়িতে তখন কণা ১২টা ধরা হয়। এ মধ্যাহ্ন সময় থেকে দিনের অন্যান্য সময় স্থির করা হয়। একে কোনো স্থানের স্থানীয় সময় বলা হয়। সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যেও স্থানীয় সময় নির্ণয় করা যায়। পৃথিবীর কেন্দ্রে কোণের পরিমাণ ৩৬০ ডিগ্রি। এই ৩৬০ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্ব আবর্তন করতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা বা $(24 \times 60) = 1,440$ মিনিট সময় লাগে। সুতরাং পৃথিবী ১ ডিগ্রি ঘোরে $(1,440 \div 360) = 4$ মিনিট সময়ে অর্থাৎ প্রতি ১ ডিগ্রি দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট।

প্রমাণ সময় (Standard Time) : দ্রাঘিমারেখার উপর মধ্যাহ্ন সূর্যের অবস্থানের সময়কালকে দুপুর ১২টা ধরে স্থানীয় সময় নির্ধারণ করলে একই দেশের মধ্যে সময় গণনার বিভ্রাট হয়। সেজন্য প্রত্যেক দেশের একটি প্রমাণ সময় নির্ণয় করা হয়। প্রত্যেক দেশেই সেই দেশের মধ্যভাগের কোনো স্থানের দ্রাঘিমারেখা অনুযায়ী যে সময় নির্ণয় করা হয় সে সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় বণে। অনেক বড়ো দেশ হলে কয়েকটি প্রমাণ সময় থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চারটি এবং কানাডাতে পাঁচটি প্রমাণ সময় রয়েছে। গ্রিনিচের (০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা) স্থানীয় সময়কে সমগ্র পৃথিবীর প্রমাণ সময় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রমাণ সময় গ্রিনিচের সময় অপেক্ষা ৬ ঘণ্টা অগ্রবর্তী। ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমারেখা বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত। এ কারণে এ দ্রাঘিমার স্থানীয় সময়কে বাংলাদেশের প্রমাণ সময় ধরে কাজ করা হয়।

কাজ
একক : স্থানীয় সময় ও প্রমাণ
সময় নির্ণয় কর।

নিচের উদাহরণ দুটি থেকে দ্রাঘিমা ও সময়ের সম্পর্ক বোঝা যাবে।

> ঢাকা ও সিউলের সময়ের ব্যবধান ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট। ঢাকার দ্রাঘিমা 90° পূর্ব হলে সিউলের দ্রাঘিমা কত (সিউল ঢাকার পূর্বে অবস্থিত)?

সিউল ঢাকার পূর্বে অবস্থিত হওয়ায় এর দ্রাঘিমা বেশি হবে।

ঢাকা ও সিউলের সময়ের ব্যবধান ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট = 152 মিনিট।

৪ মিনিট সময়ের ব্যবধানে দ্রাঘিমার ব্যবধান হয় 1°

সুতরাং, ১ মিনিট সময়ের ব্যবধানে দ্রাঘিমার ব্যবধান হয় $\left(\frac{1}{4}\right)^\circ$

সুতরাং, 152 মিনিট সময়ের ব্যবধানে দ্রাঘিমার ব্যবধান হয় $\left(\frac{1 \times 152}{4}\right)^\circ = 38^\circ$

অতএব, সিউলের দ্রাঘিমা $90^\circ + 38^\circ = 128^\circ$

উত্তর: সিউলের দ্রাঘিমা 128° পূর্ব।

◆ ঢাকা ও চেন্নাইয়ের দ্রাঘিমা যথাক্রমে 90° পূর্ব এবং $80^\circ 15'$ পূর্ব। ঢাকার যখন মধ্যাহ্ন চেন্নাইয়ের স্থানীয় সময় তখন কত?

ঢাকা ও চেন্নাইয়ের মধ্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য, $90^\circ - 80^\circ 15' = 9^\circ 45'$

1° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট।

অতএব, 9° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় $9 \times 4 = 36$ মিনিট। $15'$ দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয়

৪ সেকেন্ড সুতরাং $84'$ দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় $84' \times 4 = 336$ সেকেন্ড = ৫ মিনিট।

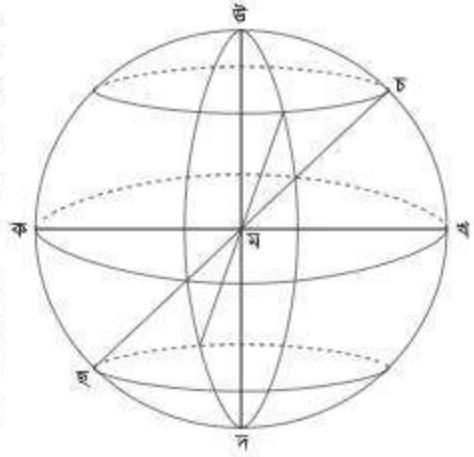
সুতরাং, $৯^{\circ}৪৫'$ দ্রাঘিমার জন্য মোট সময়ের পার্থক্য হয় ৩৬ মিনিট + ৩ মিনিট = ৩৯ মিনিট।

চেন্নাই ঢাকার পশ্চিমে অবস্থিত। চেন্নাইয়ের দ্রাঘিমা কম। সেজন্য চেন্নাইয়ের সময়ও কম।

সুতরাং, ঢাকায় যখন মধ্যাহ্ন অর্থাৎ দুপুর ১২ টা তখন চেন্নাইয়ের স্থানীয় সময় হবে, ১২ টা- ৩৯ মিনিট = সকাল ১১ টা ২১ মিনিট।

উত্তর: চেন্নাইয়ের স্থানীয় সময় সকাল ১১ টা ২১ মিনিট।

প্রতিপাদ স্থান (Antipode) : ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত কোনো বিন্দুর বিপরীত বিন্দুকে সেই বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান বলে। প্রতিপাদ স্থান সম্পূর্ণভাবে একে অন্যের বিপরীত দিকে থাকে। প্রতিপাদ স্থান নির্ণয় করার জন্য ভূপৃষ্ঠের কোনো বিন্দু থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ঠিক বিপরীত দিকে একটি কল্পিত রেখা টানা হয়। এই কল্পিত রেখা যে বিন্দুতে ভূপৃষ্ঠের বিপরীত পাশে এসে পৌঁছায় সেই বিন্দুই পূর্ব বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান চিত্র ৩.৪ ক স্থানের প্রতিপাদ স্থান খ আর চ স্থানের প্রতিপাদ স্থান হ। কোনো স্থানের অক্ষাংশ জানা থাকলে তার প্রতিপাদ স্থানেরও অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। কোনো স্থানের অক্ষাংশ যত ডিগ্রি, এর প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ তত ডিগ্রি হবে। স্থান দুটি একটি নিরক্ষরেখার উত্তরে ও অপরটি দক্ষিণে অবস্থিত হবে। দুটি স্থান দুই গোলার্ধে হবে। একটি স্থানের অক্ষাংশ ৭০ ডিগ্রি উত্তর হলে তার প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ ৭০ ডিগ্রি দক্ষিণ হবে। কোনো স্থানের দ্রাঘিমা এবং এর প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা যোগ করলে ১৮০ ডিগ্রি হবে। সুতরাং, ১৮০ ডিগ্রি থেকে এক স্থানের দ্রাঘিমা বাদ দিলে এর প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা পাওয়া যায়। এক স্থানের দ্রাঘিমা পূর্ব হলে এর প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা পশ্চিমে হবে। যেমন, ৪০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত স্থানের প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা হবে $১৮০-৪০$ ডিগ্রি = ১৪০ ডিগ্রি পশ্চিম। স্থান দুটির মধ্যে সময়ের পার্থক্য হবে ১২ ঘন্টা।



চিত্র ৩.৪ : প্রতিপাদ স্থান

চিত্রে চ বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান হ বিন্দু (চিত্র দেখ)। ঢাকার প্রতিপাদ স্থান দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত।

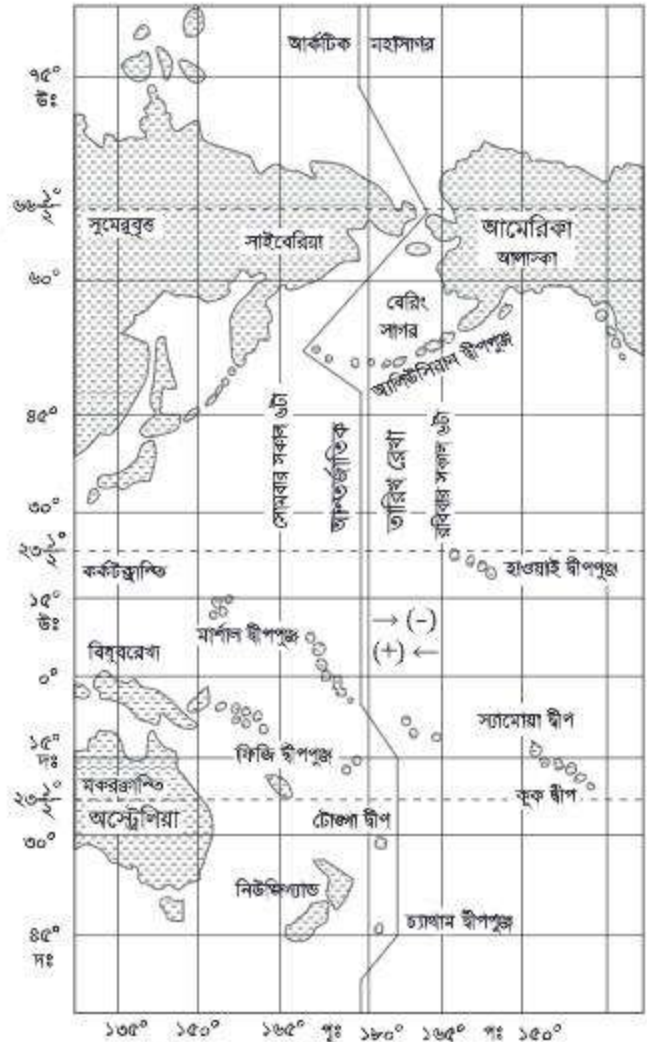
আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (International Date Line)

কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করার সময় স্থানীয় সময়ের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহের দিন বা বার নিয়েও গরমিল হয়। কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ১৮০ ডিগ্রি দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করলে সময় নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখাকে অকলম্বন করে সম্পূর্ণভাবে জলভাগের উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি রেখা কল্পনা করা হয়। এ কল্পিত রেখাটিকে 'আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা' বলে।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা : আমরা জানি, ১ ডিগ্রি দ্রাঘিমাভেদে ৪ মিনিট সময়ের ব্যবধান হয়। সুতরাং ১৫ ডিগ্রি দ্রাঘিমাভেদে সময়ের ব্যবধান হবে ১ ঘন্টা। এভাবে মূল মধ্যরেখা (গ্রিনিচের দ্রাঘিমা) থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকলে ১৮০ ডিগ্রি দ্রাঘিমায় ১২ ঘন্টা সময় বেশি হয় এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে ১২ ঘন্টা সময় কম হয়। সুতরাং, মূল মধ্যরেখায় যখন সোমবার সকাল ১০ টা তখন ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমায় স্থানীয় সময় সোমবার রাত ১০ টা।

এভাবে আবার ঠিক পশ্চিম দিক দিয়ে দ্রাঘিমা গণনা করলে ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমায় স্থানীয় সময় হবে তার পূর্ব দিন অর্থাৎ রবিবার রাত ১০টা। কিন্তু ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব ও ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা মূলত একই রেখা। সুতরাং, দেখা যায় একই দ্রাঘিমায় স্থানীয় সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ২৪ ঘণ্টা বা একদিন।

একই স্থানে কোথাও রবিবার কোথাও সোমবার। কিন্তু একই দ্রাঘিমারেখায় একই সঙ্গে রবিবার রাত ১০টা ও সোমবার রাত ১০টা হতে পারে না। এ অসুবিধা দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগরের জনভাগের উপর মানচিত্রে ১৮০ ডিগ্রি দ্রাঘিমারেখাকে অবলম্বন করে একটি রেখা বঙ্কনা করা হয়েছে। এটিই আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা। এ রেখা অতিক্রম করলে দিন এবং তারিখের পরিবর্তন হয় বলে এ রেখাটিকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে (চিত্র ৩.৫ দেখ)। এটি সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ অ্যান্টিউসিয়ান, ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে গিয়েছে। স্থানীয় লোকদের বারের হিসেবে অসুবিধা দূর করার জন্য রেখাটিকে বেরিং প্রণালিতে ১২° পূর্ব, অ্যান্টিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কাছে ৭০° পশ্চিম এবং ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের কাছে ১১° পূর্ব দিকে বেকে জলভাগের উপর দিয়ে কঙ্কনা করা হয়েছে।



চিত্র ৩.৫ : আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

খ্রিষ্টাব্দ থেকে পূর্বগামী কোনো জাহাজ বা বিমান এ রেখা অতিক্রম করলে স্থানীয় সময়ের সঙ্গে মিল রাখার জন্য তাদের বর্ধিত সময় থেকে একদিন বিয়োগ করে এবং পশ্চিমগামী জাহাজ বা বিমান তাদের কম সময়ের সঙ্গে একদিন যোগ করে তারিখ গণনা করে থাকে।

সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রেখার ভূমিকা

পৃথিবী প্রায় একটি গোলকের ন্যায়। তাই পৃথিবীর মানচিত্রে সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রেখার ভূমিকা অপরিহার্য। গোলাকার পৃথিবী নিজ অক্ষ বা মেরুরেখায় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে। ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্যের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। যে সময়ে কোনো স্থানের মধ্যরেখা সূর্যের ঠিক সামনে আসে তখন ঐ স্থানে দুপুর হয় এবং ঘড়িতে তখন ১২টা বাজে। দুপুর বা মধ্যাহ্ন অনুসারে অন্যান্য সময় নির্ণয় করা হয়। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে বিধায় পূর্বে অবস্থিত স্থানসমূহে আগে সূর্যোদয় হয়। কোনো স্থানের সময় বেলা ১টা হলে তার ১° পূর্বের স্থানে সময় বেলা ১টা ৪ মিনিট এবং ১° পশ্চিমের স্থানে বেলা ১২টা ৫৬ মিনিট হবে। খ্রিষ্টাব্দে (০°) যখন সকাল ৮টা, তখন

কোনো স্থানে সকাল ১০টা হলে উক্ত স্থানের দ্রাঘিমা হবে 30° পূর্ব। আবার সময় গ্রিনিচের চেয়ে কম হলে উক্ত স্থানটি গ্রিনিচের পশ্চিমে অবস্থিত হবে। এভাবে দ্রাঘিমার অবস্থান থেকে সময় ও সময়ের অবস্থান থেকে দ্রাঘিমা নির্ণয় করা হয়।

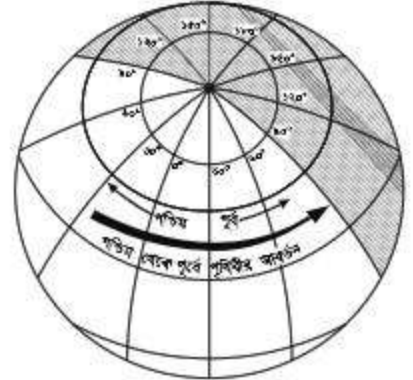
পরিচ্ছেদ ৩.৩ : পৃথিবীর গতি

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রতিদিন সূর্য পূর্বদিকে ওঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়। কিন্তু আমরা কখনো কী ভেবে দেখেছি কেন এমনটা হয়? এর কারণ পৃথিবী গতিশীল। মহাকর্ষ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী নিজ অক্ষে আবর্তন করছে ও নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করছে। এটিই পৃথিবীর গতি। পৃথিবীর গতি দুই প্রকার— আন্থিক গতি ও বার্ষিক গতি।

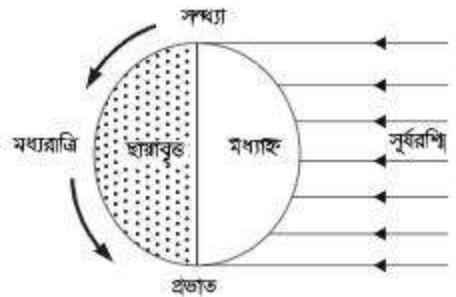
আন্থিক গতি : আমরা নিচের ৩.৭ এর চিত্রের দিকে তাকাই। সেখানে কী দেখতে পাচ্ছি? সেখানে রয়েছে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি ও একটি গোলক। লক্ষ্য করলে দেখব যে, গোলকের একদিকে আলোকিত এবং অন্যদিকে অন্ধকার। পৃথিবীতে আন্থিক গতির ফলে ঠিক এভাবেই দিন ও রাত সংঘটিত হয়। পৃথিবী নিজ অক্ষে বা মেরুরেখায় পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে আবর্তন করছে। এভাবে আবর্তন করতে পৃথিবীর প্রায় ২৪ ঘণ্টা বা একদিন সময় লাগে। সঠিকভাবে এ সময় হলো ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড। পৃথিবীর এ গতিকে আন্থিক গতি বা দৈনিক গতি (Diurnal Motion) বলে। পৃথিবীর একটি পূর্ণ আবর্তনের সময়কে সৌরদিন বলে।

আন্থিক গতির ফলে দিন ও রাত হয়। পৃথিবীর নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়। পৃথিবী গোলাকার বলে সূর্যের আলো একই সময়ে ভূপৃষ্ঠের সকল অংশে পড়ে না। আবর্তনের সময় যে অংশে আলো পড়ে সে অংশে দিন এবং যে অংশে অন্ধকার থাকে সে অংশে রাত হয়। এভাবেই দিন-রাত হয়ে থাকে। আন্থিক গতির ফলে সময় গণনা করা যায়। পৃথিবীর একটি পূর্ণ আবর্তনকে ২৪ ঘণ্টা ধরে সেটাকে মিনিট ও সেকেন্ডে বিভক্ত করে সময় গণনা করা যায়। আন্থিক গতির ফলে চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার ও ভাটা হয়। আন্থিক গতি সমুদ্রপ্রোত ও বায়ুপ্রবাহের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

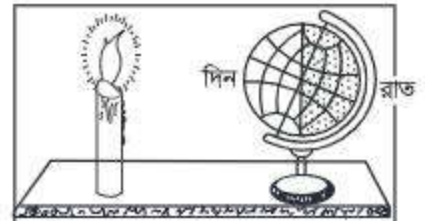
পরীক্ষা : একটি অন্ধকার ঘরে টেবিলের উপর জ্বলন্ত মোমবাতিকে সূর্য এবং ভূগোলকে পৃথিবী হিসেবে কল্পনা কর। জ্বলন্ত মোমবাতির সামনে ভূগোলকটি ঘুরালে দেখা যাবে বাতির সন্মুখের অংশ আলোকিত এবং তার বিপরীত অংশ অন্ধকার থাকে। আলোকিত অংশে দিন এবং অন্ধকার অংশে রাত হয়। পৃথিবীর আলোকিত ও অন্ধকার অংশের মধ্যবর্তী বৃত্তাকার অংশকে ছায়াবৃত্ত বলে। আবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে অংশ অন্ধকার থেকে ছায়াবৃত্ত পার হয়ে সবেমাত্র আলোকিত অংশে পৌঁছায় সেখানে প্রভাত হয়। যে অংশ আলো থেকে ছায়াবৃত্ত পার হয়ে সবেমাত্র অন্ধকারে পৌঁছায় সেখানে সন্ধ্যা হয়। প্রভাতের কিছু পূর্বে যে সময় ক্ষীণ আলো থাকে তখন উষা এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্বে যে সময় ক্ষীণ আলো থাকে সে সময়কে গোখুলি বলে।



চিত্র ৩.৬ : পৃথিবীর আবর্তন



চিত্র ৩.৭ : দিনরাত্রি সংঘটন



চিত্র ৩.৮ : মোমবাতি ও গোলকের সাহায্যে দিনরাত্রি

বার্ষিক গতি : পৃথিবী নিজ অক্ষে অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে একটি নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে, নির্দিষ্ট দিকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করেছে। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পৃথিবীর এই পরিক্রমণকে বার্ষিক গতি (Annual Motion) বলে। পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যকে পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর এক বছর সময় লাগে। এ সময়কে সৌরবছর বলা হয়। ঠিক হিসাবে এ সময় হলো ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। কিন্তু ৩৬৫ দিনে সৌরবছর গণনা করা হয়। তাই প্রতি চার বছরে একদিন বাড়িয়ে খ্রিস্টীয় চতুর্থ বছর ৩৬৬ দিনে বছর গণনা করা হয়। সে বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের পরিবর্তে ২৯ দিনে ধরা হয়। এরূপ বছরকে অধিবর্ষ বা লিপইয়ার (Leap Year) বলে। বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীতে দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

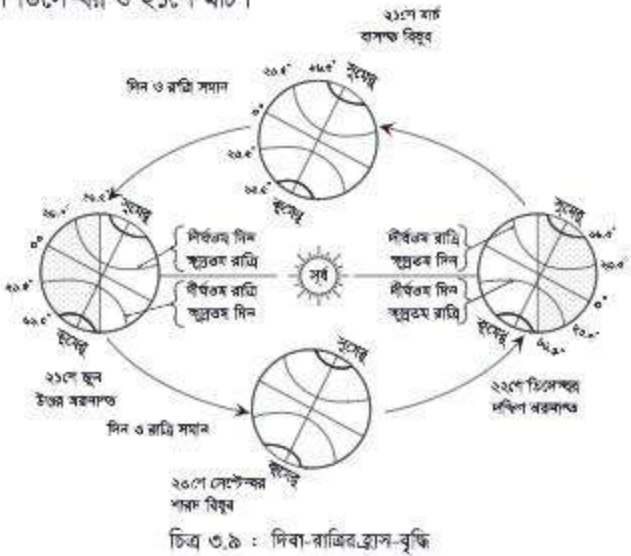
দিবা রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি এবং ঋতু পরিবর্তনে বার্ষিক গতির ভূমিকা

আমরা লক্ষ করেছি যে, বছরের বিভিন্ন সময়ের দিন ও রাতের সময়ের ব্যবধান হয়। অর্থাৎ কোনো সময় দিন বড়ো থাকে আবার কোনো সময় রাত বড়ো থাকে। আমরা কখনো কি ভেবে দেখেছি কেন এই তারতম্য ঘটে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বার্ষিক গতির ফলে এই তারতম্য ঘটে।

দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির কারণ

আমরা নিচের চিত্রের দিকে লক্ষ করি। এখানে সূর্যকে পরিক্রমণকালে কক্ষপথে পৃথিবীর চারটি অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যথা : ২১শে জুন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২২শে ডিসেম্বর ও ২১শে মার্চ।

২১শে জুন : পৃথিবী সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণকালে ২১শে জুন কক্ষপথের এমন এক অবস্থানে পৌঁছে যেখানে উত্তর মেরু সূর্যের দিকে সর্বাঙ্গীকভাবে বেশি কোণে (২৩.৫°) ঝুঁকে থাকে এবং দক্ষিণ মেরু সূর্য থেকে সর্বাঙ্গীকভাবে দূরে সরে পড়ে। এ দিন মধ্যাহ্নে ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশে সূর্যকিরণ লম্বভাবে (৯০° কোণে) পড়ে। এই তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড়ো এবং রাত সবচেয়ে ছোটো হয়। এ সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে বিপরীত অবস্থা বিরাজ করে। সুমেরুবৃত্ত (৬৬.৫° উত্তর) থেকে উত্তরে উত্তর মেরু পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা দিন ও কুমেরুবৃত্ত (৬৬.৫° দক্ষিণ) থেকে দক্ষিণে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা রাত থাকে। ২১শে জুনের পর সূর্য আর উত্তর গোলার্ধের দিকে সরে না, দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে সরতে থাকে। সূর্যের এই অস্থানকে উত্তর অয়নান্ত বলে।



চিত্র ৩.৯ : দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি

২৩শে সেপ্টেম্বর : ২১শে জুনের পর উত্তর মেরু সূর্য থেকে দূরে সরতে থাকে এবং দক্ষিণ মেরু নিকটে আসতে থাকে। এতে উত্তর গোলার্ধে ক্রমশ দিন ছোটো ও রাত বড়ো এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড়ো ও রাত ছোটো হতে থাকে। ২৩শে সেপ্টেম্বর পৃথিবী এমন এক স্থানে অবস্থান করে যখন উত্তর মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। এই দিন সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখায় লম্বভাবে (৯০° কোণে) সুমেরুবৃত্তে ও কুমেরুবৃত্তে ৬৬.৫° কোণে এবং মেরুদ্বয়ে ০° কোণে পতিত হয়। তাই এ তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়।

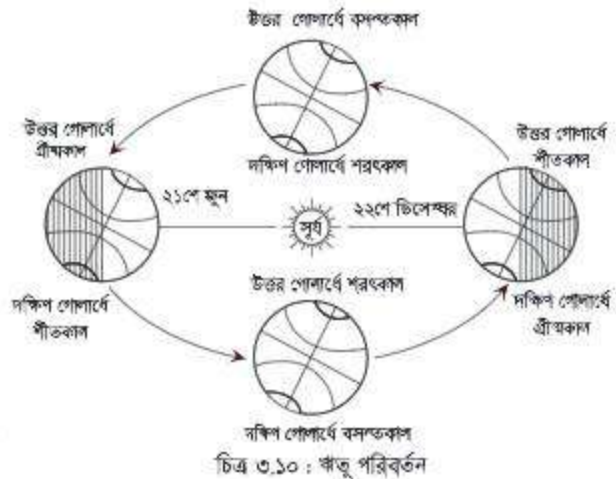
২২শে ডিসেম্বর : ২৩শে সেপ্টেম্বরের পর উত্তর মেরু সূর্য থেকে আরও দূরে সরতে থাকে এবং দক্ষিণ মেরু অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী হয়। ফলে উত্তর গোলার্ধে দিনের সময় কমতে থাকে এবং রাতের সময় বাড়তে থাকে। এভাবে ২২শে

ডিসেম্বর পৃথিবী এমন এক অবস্থানে পৌঁছে যখন দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি (২৩.৫°) হেলে থাকে। এই দিন সূর্যকিরণ মকরক্রান্তি রেখায় লম্বভাবে (৯০° কোণে) পতিত হয়। তাই এই তারিখে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড়ো এবং রাত সবচেয়ে ছোটো হয়। ২২শে ডিসেম্বরের পর সূর্য আর দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে সরে না, উত্তর গোলার্ধের দিকে সরতে থাকে। সূর্যের এই অস্থানকে দক্ষিণ অয়নান্ত বলে।

২১শে মার্চ : ২২শে ডিসেম্বরের পর পৃথিবী আপন কক্ষপথে আরও অগ্রসর হলে উত্তর মেরু ক্রমশ সূর্যের নিকট আসে এবং দক্ষিণ মেরু দূরে সরে যায়। এতে উত্তর গোলার্ধে দিন বড়ো ও রাত ছোটো হতে থাকে। অবশেষে ২১শে মার্চ পৃথিবী আপন কক্ষপথের এমন এক স্থানে পৌঁছে যেখানে উত্তর মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। এই দিন ২৩শে সেপ্টেম্বরের মতো দিবা-রাত্রি সমান হয়। পৃথিবীর এ অবস্থানকে বাসন্ত বিম্ব বলে। ২১শে মার্চের পর পৃথিবী আপন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে আবার ২১শে জুনের অবস্থায় ফিরে যায়। এভাবে পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

ঋতু পরিবর্তন

আমরা পাশের ৩.১০ চিত্রটির দিকে তাকাই। এখানে সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর চারটি অবস্থান থেকে ঋতু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক গতির জন্য সূর্যরশ্মি কোথাও লম্বভাবে আবার কোথাও তির্যকভাবে পতিত হয় এবং দিবা-রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। লম্বভাবে পতিত সূর্যরশ্মি কম বায়ুস্তর ভেদ করে আসে বলে ভূপৃষ্ঠকে অধিক উত্তপ্ত করে। তির্যকভাবে পতিত সূর্যরশ্মি যে কেবল অধিক বায়ুস্তর ভেদ করে আসে তা নয়, এটি লম্বভাবে পতিত সূর্যরশ্মি অপেক্ষা অধিক স্থানবাসী ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বছরের বিভিন্ন সময়ে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র তাপের তারতম্য হয় এবং ঋতু পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীতে সময়ভেদে তাপমাত্রার পার্থক্য বা পরিবর্তনকে ঋতু পরিবর্তন বলে। সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর চারটি অবস্থান থেকে ঋতু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।



উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল : ২১শে জুন সূর্যের উত্তরায়ণের শেষ দিন। এই দিন সূর্যরশ্মি কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে পতিত হয়। ফলে ঐ দিন এখানে দীর্ঘতম দিন এবং ক্ষুদ্রতম রাত্রি হয়। ২১শে জুনের দেড় মাস পূর্ব থেকে দেড় মাস পর পর্যন্ত মোট তিন মাস উত্তর গোলার্ধে উত্তাপ বেশি থাকে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে সূর্যের তির্যক কিরণের জন্য দক্ষিণ গোলার্ধে দিন ছোটো ও রাত বড়ো হয়। এজন্য সেখানে তখন শীতকাল।

উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল : ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পড়ে এবং সর্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়। সেজন্য এ তারিখের দেড় মাস পূর্ব থেকে দেড় মাস পর পর্যন্ত মোট তিন মাস তাপমাত্রা মধ্যম ধরনের হয়ে থাকে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল।

উত্তর গোলার্ধে শীতকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল : ২২শে ডিসেম্বর সূর্যের দক্ষিণায়ণের শেষদিন অর্থাৎ এই দিন সূর্য মকরক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে সেখানে দিন বড়ো ও রাত ছোটো হয়। এ তারিখের দেড় মাস পূর্বে ও পরে দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং উত্তর গোলার্ধে শীতকাল থাকে।

কাজ		
একক : ছক পূরণ কর		
তারিখ	উ. গোলার্ধ	দ. গোলার্ধ
২৪শে জুন		
২৫শে সেপ্টে:		
১১ই ডিসে:		

উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল : ২১শে মার্চ তারিখে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। এই দিন সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়। ২১শে মার্চের দেড় মাস পূর্ব থেকে দেড় মাস পর পর্যন্ত এই তিন মাস উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল থাকে।

ঋতু পরিবর্তনের কারণ

পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে সূর্যরশ্মি কোথাও লম্বভাবে আবার কোথাও তির্যকভাবে পতিত হয়। ফলে তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটে এবং ঋতু পরিবর্তিত হয়। বার্ষিক গতির ফলে দিন ও রাতের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। কোনো স্থানে দিবাতাপের পরিমাণ রাতের পরিমাণ হতে দীর্ঘ হলে সেই স্থানে বায়ুমণ্ডল অধিকতর উষ্ণ থাকে। এভাবে বছরের বিভিন্ন সময়ে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র তাপের তারতম্য হয় এবং ঋতু পরিবর্তন ঘটে। দিন ও রাতের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবী সবসময় ৬৬.৫° কোণে হেলে ঘুরে। ফলে বিভিন্ন স্থানে সূর্যরশ্মির পতনে কৌণিক তারতম্য ঘটে এবং ঋতু পরিবর্তিত হয়। পৃথিবীর কক্ষপথের দৈর্ঘ্য ৯৩৮০৫১৮২৭ কি.মি.। এ কক্ষপথ উপবৃত্তাকার বলে

কাজ
একক : ঋতু পরিবর্তনের
কারণসমূহ চিহ্নিত কর।

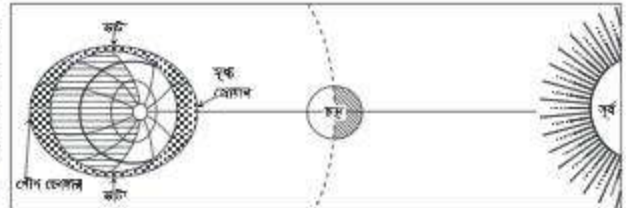
পরিক্রমণকালে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে না। জানুয়ারির ১ থেকে ৩ তারিখে সূর্য পৃথিবীর নিকটতম অবস্থানে থাকে। একে পৃথিবীর অনুসূর (Perihelion) বলে। আবার জুলাই-এর ১ থেকে ৪ তারিখে সূর্য পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে। একে পৃথিবীর অপসূর (Aphelion) বলে। সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের হ্রাসবৃদ্ধি এবং সে কারণে আপেক্ষিক আয়তনের আপাত পরিবর্তন হতে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। এর ফলে সূর্যতাপের তারতম্য হয় এবং ঋতু পরিবর্তন ঘটে। আমাদের বাংলাদেশ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এবং দেশটির মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩.৫° উত্তর অক্ষরেখা) অতিক্রম করেছে। কাজেই উত্তর গোলার্ধে ঘনত্ব পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশের ঋতু পরিবর্তিত হয়।

পরিচ্ছেদ ৩.৪: জোয়ার-ভাটা

পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর মহাসাগরে সমুদ্রস্রোত ছাড়াও পানিরাশির নিজস্ব গতি আছে। এর ফলে প্রতিদিনই কিছু সময় সমুদ্রের পানি ফুলে ওঠে ফলে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। আবার কিছু সময়ের জন্য তা নেমে যায়। সমুদ্রের পানি এভাবে নিয়মিতভাবে ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে। পৃথিবীর নিজের গতি এবং তার উপর চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাবেই মূলত জোয়ার-ভাটা সংঘটিত হয়। জোয়ার, ভাটার নানা শ্রেণি রয়েছে। পৃথিবীর উপরও জোয়ার-ভাটা নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

জোয়ার-ভাটার ধারণা, কারণ ও শ্রেণিবিভাগ

চন্দ্র ও সূর্য ভূপৃষ্ঠের জল ও স্বলভাগকে অবিরাম আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণের ফলে ভূপৃষ্ঠের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রত্যহ একস্থানে ফুলে ওঠে এবং অন্যত্র নেমে যায়। এভাবে প্রত্যেক সাড়ে বারো ঘণ্টায় সমুদ্রের পানি একবার নিয়মিতভাবে ওঠানামা করে। তবে জোয়ার ও ভাটা প্রতি ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পর পর হয়। সমুদ্র পানিরাশির নিয়মিতভাবে এ ফুলে ওঠাকে জোয়ার (High Tide) এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা (Ebb or Low Tide) বলে। সমুদ্রের মধ্যভাগে পানি সাধারণত এক থেকে তিন ফুট উঠে-নিচে হয়; কিন্তু উপকূলের নিকট সাগর উপসাগরের গভীরতা কম বলে সেখানে পানিরাশি অনেক উঠে-নিচে হয়। এ জন্য সমুদ্রের মোহনা



চিত্র ৩.১১ : জোয়ার-ভাটা

পরিচ্ছেদ ৩.৪: জোয়ার-ভাটা

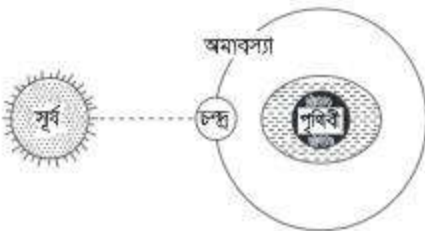
থেকে নদীসমূহের গতিপথে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত জোয়ার-ভাটা অনুভূত হয়।

জোয়ার-ভাটার কারণ : প্রাচীনকালে জোয়ার-ভাটার কারণ সম্পর্কে নানা ধরনের আবাস্তব কল্পনা করা হতো। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ শক্তি ও পৃথিবীর ওপর চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা হয়।

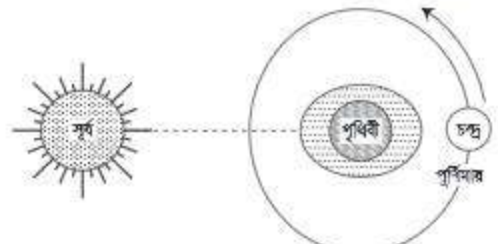
মহাকর্ষ ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব : এই মহাবিশ্বের যে কোনো পদার্থের আকর্ষণ শক্তি আছে। একটি বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে। মহাবিশ্বের দুটি বস্তুর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ শক্তিকে মহাকর্ষ শক্তি বা মহাকর্ষণ বলে। এই মহাকর্ষ শক্তির ফলে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। যে বস্তু যত বড়ো তার আকর্ষণ শক্তি তত বেশি। কিন্তু দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে মহাকর্ষ শক্তি কমে যায়। পৃথিবী এবং এর নিকটতম যে কোনো বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ বলে। অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণকে অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ বলে। সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা ২.৬০ কোটি গুণ বড়ো হলেও পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব চন্দ্রের দূরত্ব থেকে অনেক বেশি। তাই পৃথিবীর ওপর চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি সূর্য অপেক্ষা প্রায় বিগুন। পৃথিবীর ওপর চন্দ্রের যে আকর্ষণ তাই হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে জোয়ার-ভাটা হয়।

কেন্দ্রাতিগ বা কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি : পৃথিবী তার অক্ষ বা মেরুদণ্ডের ওপর থেকে চারিদিকে দ্রুত বেগে ঘুরছে বলে তার পৃষ্ঠ থেকে তরল পানিরাশি চতুর্দিকে ছিটকে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। একেই কেন্দ্রাতিগ শক্তি (Centrifugal Force) বলে। পৃথিবী ও চন্দ্রের আবর্তনের জন্য ভূপৃষ্ঠের তরল ও হালকা জলরাশির ওপর কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব অধিক হয়। এর ফলেই জলরাশি সর্বদা বাইরে নিষ্কিন্ত হয় এবং তরল জলরাশি কঠিন ভূভাগ হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। এমনভাবে কেন্দ্রাতিগ শক্তিও জোয়ার-ভাটা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

জোয়ার-ভাটার শ্রেণিবিভাগ : জোয়ার-ভাটাকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন-মুখ্য জোয়ার, গৌণ জোয়ার, ভরা কটাল ও মরা কটাল। চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। চাঁদের এই আবর্তনকালে পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের নিকটবর্তী হয় সেখানে চাঁদের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। ফলে পার্শ্ববর্তী স্থান হতে পানি এসে ঠিক চন্দ্রের নিচে ফুলে ওঠে এবং জোয়ার হয়। একে মুখ্য জোয়ার বা প্রত্যক্ষ জোয়ার বলে। মুখ্য জোয়ারের বিপরীত দিকে পানির নিচের স্থলভাগ পৃথিবীর কেন্দ্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। ফলে তার ওপর চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের আকর্ষণের সমান থাকে। এতে বিপরীত দিকের পানিরাশি অপেক্ষা স্থলভাগ চাঁদের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। এতে কেন্দ্রাতিগ শক্তির সৃষ্টি হয়। দুই দিকের পানি সে স্থানে প্রবাহিত হয়ে যে জোয়ারের সৃষ্টি করে, তাকে গৌণ জোয়ার বা পরোক্ষ জোয়ার বলে। যখন পৃথিবীর একপাশে মুখ্য জোয়ার ও অন্যপাশে গৌণ জোয়ার হয় তখন দুই জোয়ারের মধ্যবর্তী স্থল থেকে পানি সরে যায়। মধ্যবর্তী স্থলের পানির ঐ অবস্থাকে ভাটা বলে।



চিত্র ৩.১২ : তেজ কটাল বা ভরা কটাল (অমাবস্যা)

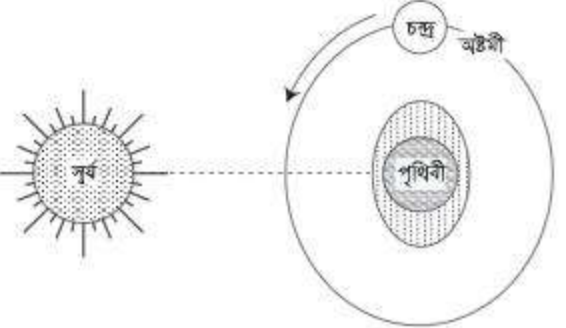


চিত্র ৩.১৩ : তেজ কটাল বা ভরা কটাল (পূর্ণিমা)

অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একই পাশে এবং পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীর এক পাশে চাঁদ ও অপর পাশে সূর্য অবস্থান করে। ফলে এ দুই তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য সমসূত্রে থাকে এবং উভয়ের মিলিত আকর্ষণে যে প্রবল জোয়ারের সৃষ্টি হয় তাকে তেজ কটাল বা ভরা কটাল বলে। সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর সমকোণে অবস্থান করার ফলে চন্দ্রের আকর্ষণে এ সময়ে চাঁদের দিকে জোয়ার হয়।

কিন্তু সূর্যের আকর্ষণের জন্য এ জোয়ারের বেগ তত প্রবল হয় না। এরূপ জোয়ারকে মরা কটাল বলে। এক মাসে দু'বার ভরা কটাল এবং দু'বার মরা কটাল হয়।

জোয়ার-ভাটার ব্যবধান : পৃথিবী যেমন নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম হতে পূর্বদিকে আবর্তন করছে চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীর চারদিকে পশ্চিম হতে পূর্বদিকে পরিক্রমণ করে। চন্দ্র নিজ কক্ষপথে ২৭ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। ফলে পৃথিবীর একবার আবর্তনকালে অর্থাৎ প্রায় ২৪ ঘণ্টায় চন্দ্র $(360 \div 24)$ বা 15° পথ অতিক্রম করে। পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়ই যেহেতু পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরছে তাই পৃথিবী উক্ত 15° পথ আরও $(15 \times 8) = 120^\circ$ মিনিটে অগ্রসর হয়। 1° পথ অতিক্রম করতে পৃথিবীর ৪ মিনিট সময় লাগে। কোনো নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে মুখ্য জোয়ার হওয়ার ১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট পরে সেখানে সৌণ জোয়ার হয় এবং মুখ্য জোয়ারের ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট পর সেখানে আবার মুখ্য জোয়ার হয়। এভাবে প্রত্যেক স্থানে জোয়ার শুরু ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পরে ভাঁটা হয়ে থাকে।



চিত্র ৩.১৪ : অষ্টমী তিথিতে মরা কটাল

পৃথিবীর ওপর জোয়ার-ভাটার প্রভাব

পৃথিবী তথা স্থলভাগ, পানিরাশি ও মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর জোয়ার-ভাটার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। দৈনিক দু'বার করে জোয়ার-ভাটা হওয়ার ফলে নদীর আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে পানি নির্মল হয় এবং নদী মোহনায় পলি সঞ্চিত হয় না। ফলে নদীর মুখ কন্ঠ হতে পারে না। জোয়ার-ভাটার স্রোতে নদীখাত গভীর হয়। অনেক নদীর পাশে খাল খনন করে জোয়ারের পানি আটকে জমিতে সেচ দেওয়া হয়। পৃথিবীর বহু নদীতে ভাটার স্রোতকে কাজে লাগিয়ে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ফ্রান্সের লারায়ল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ভারতের বাঙলা কদমেরও এরূপ একটি পানি বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে। জোয়ার-ভাটায় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ফলে শীতপ্রধান দেশে নদীর পানি চলাচলের অনুকূলে থাকে। জোয়ারের সময় নদীতে পানি বৃষ্টির ফলে সমুদ্রগামী বড়ো বড়ো জাহাজ অনায়াসেই নদীতে প্রবেশ করে, আবার ভাটার টানে সমুদ্রে চলে আসে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা কদমের জোয়ারের সময় নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পেলে বড়ো বড়ো জাহাজ প্রবেশ করে অথবা কদম ছেড়ে যায়। কদমের প্রবেশের পূর্বে জোয়ারের অপেক্ষায় জাহাজগুলো নদীর মোহনায় নোঙর করে থাকে। বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের পানি পদ্মা নদীতে গোয়ালন্দের কাছে এবং মেঘনা নদীতে তৈরব বাজারের কাছাকাছি পৌঁছায়। জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানিকে আবদ্ধ করে শুকিয়ে লবণ তৈরি করা হয়। ভরা কটালের সময় সমুদ্রের পানি কখনো প্রবল তরঙ্গে নদীর মোহনা দিয়ে স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করে বানের (Tidal bore) বা বন্যার সৃষ্টি করে। বানের পানির উচ্চতা ৩/৪ ফুট থেকে প্রায় ৪০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। যে নদীর মোহনা সংকীর্ণ বা সম্মুখে বালির বাঁধ থাকে, সেসব নদীতে প্রবল বান হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও বর্ষাকালে অমাবস্যা জোয়ারে প্রবল বান হতে দেখা যায়। তবে স্থলভাগে প্রবেশের পর এর বেগ কমে যায়। মেঘনা, ভাগীরথী, আমাজান প্রভৃতি নদীতেও প্রবল বান দেখা যায়। কখনো কখনো এই বানে নৌকা, স্টিমার, জাহাজসহ জাহাজসহ ব্যাপক ক্ষতি হয়।

কাজ

একক : জোয়ার-ভাটার কারণ ও পৃথিবীর উপর এর প্রভাব লিখ।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শূন্য গ্রহে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় কেন?
২. সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির অধিক সময় প্রয়োজন হয় কেন?
৩. ট্রপোপস দিয়ে বিমান চলাচল করার কারণ কী?
৪. ওজোনস্তরের তাপমাত্রা অধিক হওয়ার কারণ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রমকালে বার ও তারিখের পরিবর্তন হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
২. কোনো স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন কাল্পনিক রেখা অধিক গুরুত্বপূর্ণ?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। ইউরেনাসের উপগ্রহ কোনটি?
 - ক. ক্যাপিটাস
 - খ. এরিয়েল
 - গ. নেরাইড
 - ঘ. গ্যানিমেড
- ২। শনির বায়ুমণ্ডলে কোন গ্যাসগুলোর মিশ্রণ রয়েছে?
 - ক. নাইট্রোজেন ও হিলিয়াম
 - খ. হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম
 - গ. কার্বন ডাই-অক্সাইড ও হিলিয়াম
 - ঘ. অক্সিজেন ও হিলিয়াম
- ৩। পৃথিবী উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমণ করার কারণে —
 - i. বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব হয়
 - ii. মাধ্যাকর্ষণ শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে
 - iii. দিবারাত্রির দৈর্ঘ্যের তারতম্য ঘটে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক. i
 - খ. i ও ii
 - গ. i ও iii
 - ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অর্পিতা প্রতিদিন খুব ভোরে পড়তে বসে। একদিন সে লক্ষ করে, পূর্বদিকের আকাশে ভোরবেলাতেও একটি তারা দেখা যাচ্ছে। অর্পিতা বুঝতে পারে যে সে একটি গ্রহ দেখেছে।

৪. অর্পিতার দেখা গ্রহটির নাম কী-

- ক. শুক্ৰ
- খ. শনি
- গ. মঙ্গল
- ঘ. নেপচুন

৫. পৃথিবীর সাথে উক্ত গ্রহের কোন বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হবে?

- ক. গ্রহটির উপগ্রহ নেই
- খ. গ্রহটিতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকে
- গ. গ্রহটির চারদিকে বলয় আছে
- ঘ. গ্রহটি নীলাভ বর্ণের

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

স্থান	অক্ষরেখা	দ্রাঘিমাংস	তারিখ	সময়
A	৩০° উত্তর	১০৫° পশ্চিম	২২শে জুন	৭টা (সকাল)
B	৫০° দক্ষিণ	৫৬° পশ্চিম	২২শে জুন	?

ক. মেবুরেখা কাকে বলে?

খ. সৌরকলঙ্ক কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. ছকের A চিহ্নিত স্থানটির স্থানীয় সময় সকাল ৭টা হলে B চিহ্নিত স্থানটির স্থানীয় সময় কত হবে?

ঘ. উক্ত তারিখে দুটি স্থানে দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য কি একইরূপ হবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

২. মাইশা সুইডেনে (৬৬.৫° উত্তর অক্ষরেখা ও ১৫° পূর্ব দ্রাঘিমাংস) বসবাস করে। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি সুইডেনের স্থানীয় সময় ভোর ৬টা ক্যানবেরায় (৩৫° দক্ষিণ অক্ষরেখা ও ১৫০° পূর্ব দ্রাঘিমাংস) বসবাসরত ছোটো বোন মালিহাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানায়। মালিহা কথা প্রসঙ্গে তাকে জানায়, আগামী ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে সে সুইডেনে বেড়াতে যাবে।

ক. সৌরদিন কাকে বলে?

খ. অধিবর্ষ কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. ক্যানবেরার স্থানীয় সময় কয়টায় মাইশা টেলিফোন করেছিল?

ঘ. মালিহার বেড়াতে যাওয়ার তারিখে দুটি স্থানে কি একই ধরনের ঋতু বিরাজ করবে? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তি দাও।

৩. সিনথিয়া বাবা-মায়ের সাথে কক্সবাজার বেড়াতে যায়। সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমার আলোয় সমুদ্রের শান্ত রূপ দেখে তারা মুগ্ধ হয়। কিছুক্ষণ পরে তারা লক্ষ করে, সমুদ্রের পানি ফুলে উঠছে এবং তীরে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ছে। বাবা তাকে ভীত হতে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, সমুদ্রে এরূপ অবস্থা নিয়মিত ঘটে।

ক. জোয়ার-ভাটা কয়টি?

খ. কেন্দ্রাতিগ শক্তি কী? ব্যাখ্যা কর।

- গ. সমুদ্রের পানিতে উক্ত সময়ে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার কারণ ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর সিনথিয়ার দেখা ঘটনাটির প্রভাব আছে কি? বিশ্লেষণ কর।

৪.

স্থান	অক্ষরেখা	দ্রাঘিমাংস	তারিখ	সময়
মেক্সিকো	৩০° উত্তর	১০৫° পশ্চিম	২২শে জুন	?
উইলিং দ্বীপপুঞ্জ	৫০° দক্ষিণ	৭৫° পশ্চিম	২২শে জুন	৭ টা (সকাল)

- ক. প্রতিপাদ স্থান কাকে বলে?
 খ. দিন-তারিখ নির্ধারণে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার ভূমিকা বর্ণনা কর।
 গ. ছকে উল্লিখিত উইলিং দ্বীপপুঞ্জের স্থানীয় সময়ের সাথে মেক্সিকোর স্থানীয় সময়ের পার্থক্য কত হবে তা নির্ণয় কর।
 ঘ. উক্ত তারিখে স্থান দুটির দিবারাত্রির দৈর্ঘ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।